পিতৃপুরুষের গল্প

হারুন হাবীব

অন্তর মামা বড়ো বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, 'কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদ্দিন চাকরি না হয়।' কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভালো লাগে কাজল মামার।

১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁধে গেল যুদ্ধ। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং। আরও কত কি! অন্তর নানা কত বকতেন, 'বাবা, এসব করিস নে। বিপদে পড়বি।'

'বাবা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে, বাবা। স্বাধীনতা এবার আসবেই।' সাহস নিয়ে বলত কাজল মামা।

সেই কাজল মামার যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্তু। বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই। মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে, 'তুই এক কাজ কর অন্তু। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আরও বল, তুই যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছিস। দেখবি ঠিক আসবে।'

বুদ্ধিটা অন্তর মা'র হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ ক'দিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্তু চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিন দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ওর কেন যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনুক না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।

অন্তু বরাবর রাত ন'টা-সাড়ে ন'টায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন, 'ঘুমাতে যাস নে কেন?'

অন্তু খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতেই সে কী গভীর ঘুম!

ভোরবেলায় সে দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লেপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।

মামা বললেন, 'ভালো আছিস তুই অন্তু? শেষ রাতের ট্রেনে এলাম। এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস।' অন্তু বলে, 'আজ কিন্তু উনিশ তারিখ, তা তো জানো মামা। দু'দিন বাদেই একুশে ফেব্রুয়ারি।'

মামা বললেন, 'ঠিক আছে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়েই বেরুব তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচদিন আমি ঢাকায় থাকব — এর মধ্যে চারদিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাইবি যাব। যত গল্প শুনতে চাস শোনাব।'

মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড থেকে একটি রিকশায় চাপল অন্তু আর কাজল মামা। লালমাটিয়া-ধানমণ্ডি হয়ে রিকশা চলছিল। মামা বললেন, 'এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এর নাম সাতমসজিদ রোড। জানিস?'

'কি যে বলো মামা! জানব না কেন?'

'ঠিক আছে বল দেখি, সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?'

'তা তো ঠিক জানি না।'

'এই জন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভালো আমাদের। অতীত মানে আমাদের আগের দিন। পুরোনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে।'

কাজল মামা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে সাতগম্বুজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরোনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ঢুকতেই অন্তু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মামা?'

'হ্যাঁ, পড়তাম একদিন। তুই জানলি কী করে?'

'মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই যুদ্ধে গিয়েছ।'

'অন্তু, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়, একদেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ — কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য, সব অন্যায়-অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য। একাত্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম — সাধারণ যুদ্ধ নয়।'

দেখতে দেখতে রিকশাটা রোকেয়া হল আর শামসুন্নাহার হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌঁছাল। কাজল মামা বললেন, 'এই যে ডান পাশে বিল্ডিংটা দেখছিস, ওটার নাম কি জানিস?'

'না।'

'জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে।'

'তুমি থাকতে এখানে?'

'না। আমি থাকতাম হাজী মুহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাতে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।'

'কেন?'

'কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্ররা যেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হলো ওরাই প্রথম।'

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দু'দিন বাদেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। মামা বললেন, 'অন্তু, এই পৃথিবীতে অসংখ্য-অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীন হয়েছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের করুণ কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।'

অন্তু মামাকে বলে, 'মামা, এবার কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?'

'আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব। বলতো অন্তু, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?'

'মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।'

অন্তুর স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, 'তুই তো বেশ কিছু জানিস অন্তু। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হলো আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটায় যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে।

চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।'

অন্তর মুখ দেখে কাজল মামা বুঝলেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অন্ত। মামাকে বলে, 'মামা, তুমিও তখন এখানে ছিলে?'

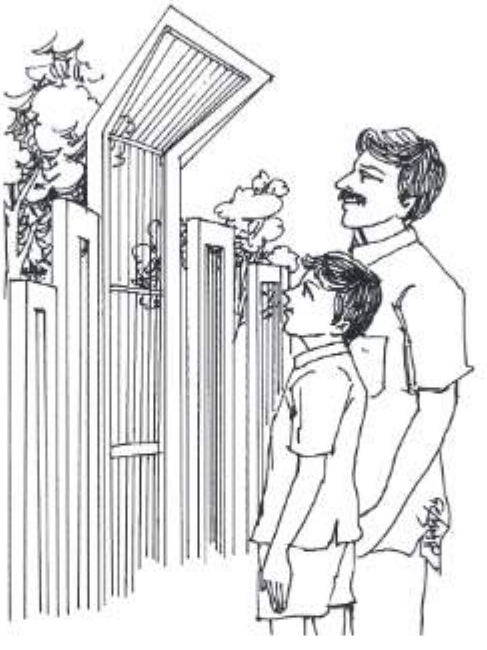

'নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছোটো। এখানে যাঁরা বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়ো। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ — ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব — শ্রদ্ধা করব।'

কাজল মামার হাত ধরে অন্ত একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে শহিদ মিনারের ওপরে ওঠে। মামার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির কাহিনি শুনে সে আগ্রহী হয় নিজ জাতির অতীত সংগ্রামের আরও কাহিনি শুনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অন্ত বলে, 'তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলো মামা।'

'একুশে ফেব্রুয়ারির দিন যখন ফুল দিতে আসবি, সেদিন আরও বলব। আজ শুধু এটুকুই বলি — এই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তা-ই নয় একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রাম আরও উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।'

'সেই মুক্তিযুদ্ধে তুমি ছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।'

'বলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?'

'ঠিক।'

শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্তু জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, 'অন্তু চল, আমরা দু'জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।'

অন্তু ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

হানাদার বাহিনী — অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে। এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।

তিতিক্ষা — সহনশীলতা।

সামরিক শাসন — সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।

পিতৃপুরুষ — পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পটির কিশোর অন্তু ঢাকায় বসবাস করে। মায়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী সংগ্রামের গল্প শুনে অন্তুর মনে মামার মুখ থেকে যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ জাগে। সে মামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। একুশে ফেব্রুয়ারির দু'দিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার কাছেই শুরু হয় অন্তুর অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অন্তু জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, সাতমসজিদ রাস্তার নামের ইতিহাস। জানতে পারে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে কিশোর অন্তু স্মৃতিসৌধ, মাতৃভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনারসহ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষ কারা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

লেখক-পরিচিতি

কথাসাহিত্যিক হারুন হাবীব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১-এর রণাঙ্গন সংবাদদাতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: 'প্রিয়যোদ্ধা', 'ছোটগল্প–সমগ্র ১৯৭১,' 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ,' ' Blood and Brutality ' ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে জামালপুরে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত – ১০টি বাক্যে তা লিখ।

খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লিখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোগল আমলে ঢাকার নাম ছিল

ক. বাবরনগর খ. হুমায়ুননগর

গ. আকবরনগর ঘ. জাহাঙ্গীরনগর

২. অন্তর নানা কাজলকে বকতেন কেন?

ক. ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায়

খ. গ্রামে চলে যাওয়াতে

গ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে

ঘ. চাকরি হয়নি বলে

নিচের উদ্দীপক পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

(১) "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"

(২) "মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।"

৩. উদ্দীপকের প্রথম অংশটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

i. ভাষা আন্দোলন

ii. মুক্তিযুদ্ধ

iii. ইতিহাস-ঐতিহ্য

নিচের **কোনটি সঠিক?**

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব নিচের কোন কথাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. স্বাধীনতা এবার আসবেই

খ. যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ

গ. অনেক রক্তের ইতিহাস আছে

ঘ. ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবার কাছে ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে মনটা ভরে ওঠে প্রিয়তির।

ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়ত?

খ. 'যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ' – উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. অন্তু ও প্রিয়তির মনোভাব কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ''উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।''– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।